ISSN : 2320-5598

# লোকস্বর

নবম বর্ষ, ১৭তম সংখ্যা
মার্চ, ২০২১

PEER REVIEWED RESEARCH JOURNAL

# লোকস্বর

**Peer-Reviewed Research Journal**
**9th Year, Vol. 17, March 2021**

সম্পাদক
ড. সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

কার্য-নির্বাহী সম্পাদক
ড. মনোজ মণ্ডল

সংখ্যা-সম্পাদক
ড. গোবিন্দ রাজবংশী

লোকস্বর
মরালী প্রকাশনী
ঝিলপাড় রোড, বাকসাড়া, হাওড়া-৭১১১১০

**Lokoswar**

A Peer-Reviewed Research Journal

**ISSN : 2320-5598**

Edited by Dr. Sukanta Mukhopadhay (Editor) & Dr. Manoj Mandal (Executive Editor),

9th Year, Vol. 17, March 2021

Rs. 450/-

Mobile-9339590771

Mobile- 9830432239

Journal Office Address : Rammohan Apartment, 19, Rammohan Mukherjee Lane, Shibpur, Howrah-2

e-mail : lokoswarjounal@gmail.com

প্রকাশ

নবম বর্ষ, ১৭তম সংখ্যা

১৬ মার্চ, ২০২১

বর্ণ প্রতিস্থাপন ও প্রকাশ

Marali Prakasani

Jhilpar Road, Baksara, Howrah-711110

Mobile- 9339590771

মূল্য : ৮০০ টাকা

**'LOKOSWAR'** is a peer reviewed Multi-disciplinary Research Journal ( ISSN : 2320-5598 ) All articles published in this Journal are selected by the Peer Review Committee. The committees of this Journal as are follows –


## President : Shree Pramod Nath

## Advisory, Review & Editorial Committee

1. Dr. Barunkumar Chakraborty, Folklorist & Ex Professor
2. Dr. Tapankumar Biswas, Vice-Chancellor, Harichand Guru-chand University
3. Dr. Sanatkumar Naskar, Professor, University of Calcutta
4. Dr. Rejaul Karim, Professor, Aliah University
5. Dr. Souren Banerji, Professor, Gourbanga University
6. Dr. Sandipkumar Mandal, Professor, Presidency University
7. Dr. Tapan Mandal, Prof. Daimond Harbor Womens University
8. Dr. Rafikul Hossain, Professor, University of Calcutta
9. Dr. Bela Das, Professor, Asam University
10. Dr. Sumita Chaterji, Professor, Benaras Hindu University
11. Dr. Krisnendu Dutta, Professor, Sikim University
12. Dr. Suranjan Middey, Professor, Rabindra Bharati University
13. Dr. Tapankumar Khanra, Professor, Kolhan University
14. Dr. Ashis Roy, Professor, North Bengal University
15. Dr. Subhas Biswas, Professor, Kalyni University
16. Dr. Sujitkumar Pal, Professor, Vidyasagar University
17. Dr. Selim Box Mandal, Prof. Panchananbarma University
18. Dr. Goutam Mukherji, Professor, Ranchi University
19. Dr. Tapankumar Mandal, Professor, Kolhan University
20. Dr. Nabanita Basu, Profesor, Singur Gov. College
21. Profesor Rachana Roy, Amdanga Jugalkishor Mahabidyalaya
22. Dr. Santanu Dalai, Profesor, Egra Sashibhusan College
23. Dr. Ashiskumar Sahu, Sankrail A.B. S. Mahabidyalaya

24. Dr. Nirmalyo Mandal, Professr, New Alipur College
25. Dr. Gopa Biswas, Professor, Bidyanagar College
26.Dr. Sukanta Majumdar, Dept. Controller of exam, Kalyani University
27. Dr. Pranb Barman, Professor, Bhattar College, Dantan, Medinipur(W)
28. Susovan Pyne, SACT, Thakurpukur Vivekananda College

**Editor**
Dr. Sukanta Mukhapadhay
**Executive Editor**
Dr. Manoj Mandal

| | | |
|---|---|---|
| রক্তক্ষরণ ও প্রতিবাদের নাটক 'কবর' | সুব্রত মণ্ডল | ২৫৫ |
| নতুন ইহুদী : ছিন্নমূলের ছেঁড়া পাতা | মল্লিকা যন্নিগ্রহী | ২৬৪ |
| মঞ্চ অভিনেত্রী বিনোদিনী | দেবযানী দে | ২৭০ |
| সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ছোটগল্পে মৃত্যুচেতনা | শ্রাবন্তী বর্মন | ২৭৬ |
| সিরাজের ছোটোগল্পে আদিম-স্বাধীনতার স্রোত ও কামান্ধ মানুষের বিকৃত মানসিকতা | অপূর্ব পাহাড় | ২৮৪ |
| নারী জাগরণের পুরোধা রূপে স্বামীজী | প্রণব ঘোষ | ২৯৪ |
| আদিবাসীদের সমাজ ও ধর্ম জীবন : একটি পর্যালোচনা | সুদীপ্ত সেন | ৩০৪ |
| আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু : শহীদুল জহির | মিজানুর রহমান | ৩১৩ |
| সুন্দরবনের প্রকৃতি-পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ | প্রভাস মণ্ডল | ৩২৩ |
| সুন্দরবনের বৈচিত্র্যে ম্যানগ্রোভ : তথ্যমূলক সমীক্ষা | রেখা মণ্ডল | ৩৩১ |
| অমেলন্দু চক্রবর্তীর 'অধিরথ সূতপুত্র' : এক 'রিফিউজি'র বিষাদ সিন্ধুর আখ্যান | সেলিম বক্স মন্ডল | ৩৩৯ |
| কদর্য বাস্তবতার বিরুদ্ধে নজরুলের স্বদেশীয়ানা ও বিপ্লবী প্রতিবেদন | গোবিন্দ রাজবংশী | ৩৪৩ |
| প্রেমে প্রতিবাদে | আশিস রায় | ৩৪৯ |
| রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ভাষা বৈশিষ্ট্য | সমীরণ বেরা | ৩৬৯ |
| বাঙালির ভাষাসংকট, আন্দোলন ও উত্তরণ | প্রভাতচন্দ্র সরকার | ৩৭৬ |
| বাংলার ধান্য-সংস্কৃতি | মনোজ মণ্ডল | ৩৮৩ |
| পত্রপত্রিকায় জনজাতি সাহিত্য চর্চা : প্রসঙ্গ আলিপুরদুয়ার জেলা | সুকান্ত মুখোপাধ্যায় | ৩৯০ |
| The Negative and Stereotypical Representation of Disability in Society, in Literature and in Cinema | Prasanta Rakshit | ৩৯৮ |
| Swami Vivekananda, The Legendary Hero, and his Positive Techniques of Upbringing Societal Norms | Rimita Bhar | ৪০৫ |
| Culture and Education | Sanghamitra Roy | ৪১৮ |
| British Penetration and Emergence of Modern Education in Cooch Behar State | Bappa Mohanta | ৪২৭ |

# প্রেমে প্রতিবাদে

আশিস রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

এই বেশ ভাল আছি- এমনটা বলা সহজ, যাপন সহজ নয়। ভালো থাকার নিয়ত কাঠপিঁপড়ের খোকলা করে দেওয়ার চক্রান্তের মধ্যে যাতনাময় ভালোবাসার সংরাগে আড্রিনালিন ক্ষরণ নিরবচ্ছিন্ন সহজ কথা নয়। যদি ভালোবাসার মানুষটার চোখের কর্নিয়ায় বাবার হাতে মায়ের শরীরটা পুরোনো হওয়ার ভবিতব্য ফুটে ওঠে তবে তো মনে হবেই সব আঁখি বন্ধ হোক। বাঁ হাতে খারাপ কাজ করে ডান হাতে প্রশংসা লিখলে ক্লান্তি এলে জমে ওঠে বিক্ষোভ। কথার পিঠে কথা জুড়ে যে সাহিত্য নাড়ি ছিঁড়ে সত্তাবান হয়, সেখানেও এ কথাটা খাটে। তাই বাংলা উপন্যাসে প্রেমের সঙ্গেই বাসা বাঁধে প্রতিবাদ, রোমান্টিকতার হ্যালুসিনেশনের পাশাপাশি থাকে তিক্ততার পাংচুয়েশন। 'সখি ভালোবাসা কারে কয় - সে কি কেবলই যাতনাময়' - প্রশ্নটা নিয়মমত প্রাসঙ্গিক আজও। উপন্যাসের রোমান্টিকতা যেমন একটা সন্ধান, রোমান্টিক উপন্যাসে প্রতিবাদও একটা সন্ধানের অন্তর মাত্র।

তোমার সঙ্গে এমন একটা নিবিড় যোগ হয়ে গিয়েছিল যে, এ বয়সে তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয়। তাই ভাবি –

> হে প্রিয়, আমার প্রিয়তম মোর,
> আয়োজনে কাঁপে কামনার ঘোর।

প্রত্যেক পুরুষের মানসে আছে নারী, আর নারীর পুরুষ। আমার মত আমার, তোমার মত তোমার। তৎসত্ত্বেও আমি তোমার, তুমি আমার। যেন কথার বিচিত্র কৌশল, রোমান্সের বর্ণবিলাস। ইতিহাসের নানা আকর্ষণ প্রসঙ্গ, রোমাঞ্চকর নাটকীয় মুহূর্ত, ধর্মের আচার ও বিচার, দেহভোগের বুভুক্ষা ও প্রেমের সৌকুমার্য। আবার দুজনে যে মিলবে না মিলছে না, বিচ্ছেদই কাম্য এমন ভাবনাও আছে, –

> ভালোবেসে মিটিল না আশ, কুলাল না এ জীবনে
> হায়, জীবন এত ছোট কেনে, এ ভুবনে ?

সুস্থ সুন্দর মধুময় জীবনের কাহিনি যেমন পাওয়া যাবে, তার মধ্যে আবার বেখাপ্পা জীবনও কিছুটা আছে। এমন নানান উপাদানে পরিপূর্ণ একাধিক উপন্যাস। কিন্তু রোম্যান্টিকতার আলোচনার পূর্বে বিষয়টি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

'রোম্যান্টিক' শব্দটি একটি বিশেষ ভাবলোককে আলোকিত করে তোলে। এই শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার শ্রোতার মনে কতকগুলি অনুভূতি ভেসে ওঠে, 'রহস্যময়', দূরায়ত, ঐন্দ্রজালিক কোনো ভাবনা, সাধারণ সংজ্ঞায় যার উত্তর মেলে না।

মূলে রোমান্টিক শব্দটি প্রাচীন ফরাসি 'Romanz' (escrire) রোমাঞ্জ থেকে এসেছে। চার্চ স্বীকৃত লাতিন-এর কৌলীন্যের বদলে এই শব্দের প্রকৃতত্ব ছিল সুস্পষ্ট। 'রোমান' (roman) লাতিন আহৃত নানা মাতৃভাষায় প্রচলিত ছিল। ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাস Old Lingua Roman ছিল 'Galia' (Frana) – দেশের কথ্য ভাষা কয়নিকরা একে ব্যাঙ্গার্থে বলত 'Rustica'। এই রোমানা বা রোমানিকা-র ক্রিয়া বিশেষণ 'রোমানিস' (Romanice), তা থেকে হয়েছে বিশেষ্য পদ 'রোমান্স'। এই ভাষায় প্রঁতলি ও স্প্যানিশে যে সাহিত্য লেখা হত, তার মূল ভাববস্তু অবাস্তব, অলীক ভাবনা। রোমান বলতে বোঝাত ক্ল্যাসিকাল ভাষা লাতিনের বদলে যে লেখ্য ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হত। এই ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা (vulgar tongue) যা দিয়ে মধ্যযুগের ফরাসি গাথাকাব্য বা কাহিনিকাব্য লেখা হত। রোমান যাকে আজও ফরাসিরা বলে 'les lingues romances' সেই রোমান ভাষায় লিখিত সাহিত্য সম্ভারের বৈশিষ্ট্য কী ছিল ? একজন পণ্ডিত বলেছেন, –

'From the reading of certain romantics, that is books of poetry composed in French on military deeds which are for the most part fictitious.'

(Rousseau and Romanticism, p.18)

এই সমস্ত গ্রহে বাস্তব অপেক্ষা, সত্য অপেক্ষা কল্পনা বা কাল্পনিকতার প্রাধান্য থাকত বেশি, কার্যকারণ সম্পর্ককে লঙ্ঘন করে যখন কোনো সাহিত্য আশ্চর্যজনক কোনো ভাবাবহ বা ভাবানুভূতি জাগ্রত করত তখনই তাকে বলা হত রোমান্টিক। ফলে রোমান্টিক অর্থে বোঝাত – "False as a fairy tale' or 'strange and dreamlike as a fairytale.'

রোমান্টিকতার একটি ঐতিহাসিক স্তর পর্যায় আছে : ১৬৩৮ সালে এর ব্যবহার ছিল – 'a romance – living' অর্থে, ১৬৫৪ সালে রোমান্টিক অর্থে 'fictitious' বা অবাস্তব, ১৬৬৩ সালে রোমান্সার অর্থে মিথ্যাবাদী বোঝাত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুদ্ধিবাদের প্রবর্তনায় এই অলীক বা মিথ্যার ধারণার রূপান্তর এল, তখন যে নূতন তাৎপর্যটুকু এল তা পরবর্তীকালেও ম্লান হয়ে থেকেছে – 'Strange as a romance'। সুতরাং রোমান্টিক শব্দটি জন্মসূত্রে দুটি বিশেষ ভাববন্ধকে আলোকিত করে তুলেছে – অবাস্তবধ্যান ও বিস্ময়াবহ অনুভূতি। তাই রূপকথার জগৎ আর বীরত্বমূলক অভিযানের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। কারণ এই দুই বিষয়বস্তুই একদিকে যেমন অবাস্তব বা অলীক ভাবনাকে প্রকাশ করে, অন্যদিকে বিস্ময়ানুভূতি জাগ্রত করে পাঠকদের উদ্দীপিত করে তোলে।

ফরাসিরা রোমান্টিক শব্দের পূর্বে 'রোমানেস্ক' (Ramanesque) শব্দ ব্যবহার করত, তখন এর তাৎপর্য ছিল কোনো অপ্রচলিত, অভিযান বিষয়ক বা বন্য (unusual adventurous and wild) এখন 'রোমান্টিক' বলতে বোঝায় একটি 'প্রস্থান' (School of thought) তখন তা 'রোমানেস্ক'-এর পাশে বসে একটি ভাববন্ধকে প্রকাশ করত। কাল্পনিকতায় কোনো বিস্ময়কর অভিযান যা আমাদের উদ্দীপনাকে জাগ্রত করে, যা সচরাচর ঘটে না বা কোনো বন্য ভাবানুভূতি যে ভাবলক্ষণে দ্যোতিত হত তাকে বলা হত 'romanesque' বা রোমান্টিক। ১৮৭৫ সালের কাছাকাছি সময় ফরাসি সাহিত্যে রোমান্টিক বোঝাতে বলা হত দৃশ্য। এই অর্থে রুশোর লেখায় পাওয়া যায় – "The shores of the lake of Bienne are more will and romantic then these of the lake of Geneva" – তখনও গ্রন্থ শব্দ কোনো সাহিত্যে আন্দোলন বা স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়নি, জার্মানি এবং ফ্রান্সে রোমান্টিক শব্দের সঙ্গে দৃশ্য বা প্রকৃতির অনুষঙ্গ এসেছে ইংল্যান্ড থেকে বিশেষ করে টমসনের 'Seasons'-এর জনপ্রিয় অনুবাদ বা অনুকরণে।

জার্মান মনীষীরা রোমান্টিক শব্দের একটি নির্দিষ্ট মান নির্মাণ করেছিলেন। রোমান্টিক আন্দোলন ইংল্যান্ডে জনপ্রিয় হল ম্যাডাম দ্য স্টেল-এর (Madam de Stael) 'Germany' (১৮৩১) গ্রন্থের অনুবাদের পর শ্লেগেলের 'Dramatic Art and Literature' (১৮১৫)-এর অনুবাদ এই আন্দোলনের প্রসারের উৎস। ১৮৩১ সালে বায়রন একবার বোলসকে লেখেন 'Schlegel and Madame de Sael have endeavoured to reduce poetry to two systems, classical and Romantic. The effect is only beginning." রোমান্টিসিজমের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে অনেক পণ্ডিত বলেছেন, – 'রোমান্টিসিজম মধ্যযুগের পুনর্জাগরণ।' জার্মান মনীষী হাইনের বিখ্যাত সংজ্ঞা : 'রোমান্টিসিজম কাব্যে শিল্প-সাহিত্যে মধ্যযুগের পুনর্জাগরণ। রোমান্টিসিজম যিশুখ্রিস্টর রক্তের অভিসিঞ্চিত কামনাঝুরি ফুল।' – এই সূত্র ধরে বিয়ার্স বলেছেন – romanticism, as the reproduction in modern art and literature of the life of the Middle Ages." এই মতের সমর্থকরা 'রোমান্টিসিজমই মধ্যযুগবাদ' এমন কথা বলেছেন। কিন্তু এখন এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে।

রোমান্টিক কল্পনা প্রাণময়ী ও সৃষ্টিধর্মী। অনিঃশেষ প্রাণশক্তিতে সমৃদ্ধ এই কল্পনা নবরূপের স্রষ্টা। এই কল্পনা 'নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা' – তাই সৃষ্টির 'নিত্য নব' প্রবাহে তা নিত্যনবীন, নিত্যশুচি, নিত্যস্রষ্টা। রোমান্টিক কল্পনা কতটা প্রাণময়ী তার প্রমাণ তার গতি, উদ্দামতা ও নবজগৎ সন্ধান। এই অন্বেষায় সে সততই ধৈর্যহীন, কিন্তু ক্লান্তিহীন 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে', রোমান্টিক কল্পনা যে সৃষ্টিধর্মী তার প্রমাণ তার রূপান্তরীকরণের আশ্চর্য ক্ষমতা।

বাঙালির জাতীয় স্বভাবের মধ্যে রোমান্টিক প্রেরণা আছে। সেই প্রেরণা

বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত থেকে এখনও আছে। বৈষ্ণবযুগ বা বৈষ্ণবকাব্য রোমান্টিকতার অধ্যায়। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস থেকে ক্রমানুগ ছন্দে রোমান্টিক কল্পনার মন্দ-মন্থর পদসঞ্চার। মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চর্যাপদ, চৈতন্যজীবনী কাব্যেও রোমান্টিকতার প্রভাব দেখা যায় এবং আধুনিক যুগের সমস্ত লেখকদের লেখাতেই মোটামুটিভাবে রোমান্টিকতার ভাব দেখা যায়।

এই প্রবন্ধে মূলত আলোচনা করব – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত কতকগুলি উপন্যাস নিয়ে। দিনের আলো নিভে যাওয়ার পর যখন সন্ধ্যা নেমে আসে বাংলার গৃহলক্ষ্মীর আঁচল জুড়ে, তখনও আম্রকাননে বসে কিশোরবয়স্ক বালক না জানি কোন্ এক অতলস্পর্শী রহস্যভেদের মন্ত্র আবিষ্কারের ঔৎসুক্য মনের মধ্যে আত্মগোপন করে রেখে ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণে ব্যস্ত ছিল। তার পদতলে, সবেমাত্র বিকশিত হওয়ার আনন্দে মাথা তোলা দূর্বাঘাসের ওপরে শয়ন করে সাত আট বছরের বালিকা শৈবলিনী অযান্ত্রিক আবেগে দু-চোখ রঞ্জিত করে সবিস্ময়ে ওই ষোলো বছরের কিশোরের মুখের দিকে নীরব ও নরম দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুটি বন্ধনহারা প্রাণের অবাধ প্রাণচাঞ্চল্যকর অভিব্যক্তিকেই প্রথমে স্বাগত জানালেন এবং লিখলেন, – "বালকের ন্যায় কেহ ভালোবাসিতে জানে না।" বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বালিকার কথা উপেক্ষা করে গেলেন, এখানে দেখতে পাব মূলত শৈবলিনীর প্রেম ও প্রতিবাদের কাহিনি।

প্রতাপের সঙ্গে সাত আট বছরের প্রাণোচ্ছলা শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় অঙ্কিত হয়েছে। বন্যকুসুম চয়ন করে মালা গেঁথে তা অবশেষে গাভীর শৃঙ্গে পরিয়ে দেওয়ার মধ্যে কৌতুক আছে অবশ্য, সেই সঙ্গে সপ্তপাকের মালা গলায় না ওঠার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, – 'এই রূপে ভালোবাসা জন্মিল।' আবার পরক্ষণেই সাবধানবাণী শুনিয়ে দিয়েছেন, – 'বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।' প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। শৈবলিনীর ধারণা যে ভ্রান্ত মাত্র, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লেখক বলেন, – 'শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল'। কিন্তু কঠিন ও নির্মম সংবাদ এই যে – 'এ জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নেই'।

সুতরাং মীমাংসাহীন জীবনের অঙ্কটাকে সমাধানের সরলরৈখিক পথে আনার সিদ্ধান্তে শৈবলিনীর সিদ্ধান্ত গঙ্গাবক্ষেই সলিলসমাধি করা – 'আর কেন, এইখানেই', প্রতাপ নিশ্চিত মৃত্যুর পথে সম্পর্কে ভীত শৈবলিনী 'সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।'

যে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহ হয়, সেই চন্দ্রশেখর বত্রিশ অতিক্রম করেছে। বয়সে প্রবীণ, পুঁথি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। জ্যোতিষচর্চা ও শাস্ত্র নিয়ে তিনি এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে স্বামী চন্দ্রশেখরের পত্নী শৈবলিনীর দিকে তাকানোর সুযোগ থাকে না। কিন্তু তিনি মূলত দার পরিগ্রহের বিরোধী ছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর

অবস্থার চাপে পড়ে মতের পরিবর্তন ঘটলেও তার দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। বিবাহ করলে সংসারের ঝঞ্ঝাট থেকে মনকে মুক্ত করে শাস্ত্রের দিকে মন দেওয়া যাবে এই ভাবনায় বিবাহ করেন। সে জন্য শৈবলিনীর রূপে অভিভূত হয়ে সৌন্দর্যের মোহবশত তাকে বিয়ে করেছিলেন। সে বিবাহ সমাজ অনুমোদিত হলেও মন অনুমোদিত নয়। ষোল বছরের সদ্য যৌবনা পত্নীকে মন ও মননের মুগ্ধতা দানের পরিবর্তে শুধু শুষ্ক তত্ত্ব ও জ্ঞান আহরণের চেষ্টার সঙ্গে দাম্পত্য প্রণয়ের কোনা হৃদয়বন্ধন ঘটেনি। শুধু শাস্ত্রচর্চার মধ্যে সুখানুভূতির সন্ধান মেলে না। যে কারণে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিসুধা পরিশ্রুত পথে শৈবলিনী পা রাখে। এ পথ অবশ্যই ছন্দহীন অমীমাংসিত পথ।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে ভালোবাসতেন না এমন নয়। চন্দ্রশেখর ভাবতেন – "হায় ! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত – শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন ? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ?"

এই সুখ খোঁজার জন্য শৈবলিনী প্রতাপকে দুটি বাহুর বন্ধনে পাওয়ার জন্যে ফস্টরের নৌকায় চেপেছে। ছদ্মবেশী 'নাপিতানী' সুন্দরীকে সে স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তনের অনিচ্ছা জানিয়েছে। – 'কোন সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইবে?' আসলে তার সব সুখ প্রতাপকে চিন্তা করে আবর্তিত হয়েছিল। তাই সুন্দরীর আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ তার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। রাত্রি দ্বি-প্রহরে প্রহরীর নৌকা থেকে প্রতাপ চন্দ্রশেখর-পত্নী তথা তার বাল্য প্রণয়িনীকে উদ্ধার করলেন। রামচন্দ্র তাকে প্রতাপের গৃহে বিনা অনুমতিতেই রেখে আসে। নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার পর শৈবলিনী প্রতাপকে প্রশ্ন করলে, প্রতাপ 'পাপিষ্ঠা' বলে ধিক্কার জানাল। প্রেম আজ প্রতিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। শৈবলিনী জানায় – "আমার মরাই ভালো – কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক – তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দশা কোথা হতে ? তোমা হতে ! ... কাহার জন্যে আমি গৃহধর্মে মন রাখিতে পারিলাম না ? তোমারই জন্য।"

প্রতাপের জন্যই ফস্টরের সঙ্গে শৈবলিনীর গৃহ ত্যাগ করা। শৈবলিনীর 'স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে' প্রতাপের রূপের জ্যোতি তাকে গৃহধর্মচ্যুত অবৈধ গোপন প্রণয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। শৈবলিনীর পরিষ্কার কথা – প্রতাপের রূপ ধ্যান করে তার গৃহ তার কাছে অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। তার আশায় তিনি গৃহত্যাগিনী হয়েছেন। শৈবলিনীর প্রেম কখনোই সমাজ স্বীকার করবে না। বরং এই প্রেম অপমানিত হবে। প্রতাপ এ জন্যে দ্বিতীয়বার গঙ্গাবক্ষে সন্তরণের সময় শৈবলিনীকে দিয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নেয়। এই প্রতিজ্ঞার পর শৈবলিনী জানায় – "আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্বসুখে জলাঞ্জলি ! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।" প্রতাপ-প্রত্যাখ্যাত শৈবলিনীর মনের অবস্থা নির্ণয়ে শ্রীকুমারবাবু বলেছেন, – "দীর্ঘ

কাল সঞ্চিত স্বপ্ন সুখ এক মুহূর্তে ভাঙিয়ে গেল, নিদারুণ বজ্রাঘাতে আশারচিত প্রণয়সৌধ ধূলিসাৎ হইয়া গেল।"

চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর গুহামধ্যে সাক্ষাৎলাভের পর শৈবলিনী বলল – "মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে ? কেন বিশ্বাস করিবে ? যে ভ্রষ্ট হইয়া স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি ?" তখন সত্যাশ্রয়ী চন্দ্রশেখর তাহার মনতুষ্টির জন্য কখনও বলিতেন না – "তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই – আমি জানি যে, তোমাকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া ছিল।"

শৈবলিনী মারা যায়নি। শৈবলিনীর ইশারাময় ইঙ্গিতে প্রতাপ তার কাছে গেলে, শৈবলিনী নতুন করে স্বামীর গৃহে ফিরতে চায়। কিন্তু শৈবলিনীর ধারণা প্রতাপ জীবিত থাকলে তার সুখের সম্ভাবনা নেই। শৈবলিনীর বক্তব্য – 'স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার। যে কারণে তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।' সুতরাং শৈবলিনীর প্রার্থনা – "এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষা করিও না।"

প্রতাপ বুঝতে পারল শৈবলিনী কি বলতে চাইছে। সরল ও আদর্শবাদী প্রতাপ সহজ মৃত্যুর পথে যাত্রা করল। এজন্যে অবশ্যম্ভাবী জেনেও আত্মহননের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছোল। উদ্বিগ্ন রমানন্দ স্বামীর প্রশ্নের জবাবে প্রতাপ সিংহের মতো বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানাল – কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী ! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালোবাসা বুঝিবে।... আমার ভালোবাসার নাম – জীবন বিসর্জনের আকাঙক্ষা। মনের অবচেতনে ঘুমিয়ে থাকা বাল্যপ্রণয় যখন জাগ্রত হয়েছে, তখন প্রতাপ শৈবলিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত পূর্বস্মৃতি উচ্চারণ করেছে। সে বাল্যপ্রণয়ের মধ্যে যেমন প্রেমের মধুরতা আছে আবার তিক্ততাও আছে কিন্তু তিক্ততার মাত্রা এতটাই বেশি, প্রতিবাদের পরিণামটাও এমন যে প্রতাপ নিজের আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে।

নারী পুরুষের ভালোবাসার পার্থক্য নির্ণয়ে 'Don Juan' কাব্যের প্রথম সর্গে বায়রন লিখেছিলেন –

Man's love is of Man's life a thing apart, 'Tis woman's whole existence.

মেয়েরা ভালোবাসে গার্হস্থ্য জীবন এবং পুরুষরা চায় উদ্দাম বর্হিজীবন এ কথা ব্রাউনিং 'Meeting at Night' কবিতায় বলেছেন। শরৎচন্দ্রের কমললতাও জানিয়েছে, – "ভালোবাসার অগ্নিপরীক্ষায় মেয়েরা শুধু পরীক্ষা দেয়, পুরুষ শুধুমাত্র পরীক্ষা নেয়।" স্বামী লখীন্দরকে দেবসমাজের করুণায় বাঁচিয়ে আনবার পরেও নৃত্যপটিয়সী বেহুলাকে শরীর বিজ্ঞানের পরীক্ষায় সতীত্ব প্রমাণ করবার জন্যে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, খুল্লনা ও সীতার ক্ষেত্রেও তাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উমা জননী মেনকা বলেছিল – "নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।" বিপন্না নারীরা। এরা বঙ্কিম উপন্যাসে আছে, তবে অন্যভাবে। নারীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের

শ্রদ্ধা ছিল ঠিকই। কিন্তু নারীর পদস্খলনকে তিনি ক্ষমা করেননি। এমনকি নারীর রূপবহ্নিতে দগ্ধ পুরুষপতঙ্গকে তিনি শুশ্রুষার ব্যবস্থা তো দূরে থাক, কোনরকম দরদ প্রদর্শন করেননি।

গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ত্রয়। এদের অদৃষ্ট বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে কৃষ্ণকান্ত, মাধবীনাথ ও হরলাল। শেষোক্ত চরিত্র আখ্যায়িকার প্রথম গতিবেগ জুগিয়েছে। হরলাল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে জাল বিস্তার করল তা একদিকে যেমন উইলঘটিত জটিলতার সৃষ্টি করল তেমনই রোহিণীর অবচেতন মনের সুপ্ত বাসনা জাগিয়ে তুলল।

হরলাল চতুর, স্বার্থান্ধ, বিবেকহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবক। সম্পত্তির লোভে আসল উইল হস্তগত করার জন্য রোহিণীকে কাজে লাগায়। রোহিণী উইলটি চুরি করে আনলে, যে পুরস্কার হরলাল দেবে বলেছিল তা দিতে অস্বীকার করে। জানায় – "আমি যাই হই – কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।"

গোবিন্দলাল ও রোহিণী বালাবিধ পরস্পরকে দেখে আসছে। ঘটনার যোগাযোগ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং শেষে অধঃপতন। সংসারে গোবিন্দলালের সুখের অভাব নেই। তাঁহার রূপ আছে, অর্থ আছে, ভ্রমরের মতো সাধ্বী পত্নী আছে। তিনি সকল সুখে সুখী। রোহিণী এসে ভাঙন ধরাবার পূর্বে তাদের জীবনের একটানা সুখের আভা আছে। – "ঠিক প্রভাত হয় নাই – কিছু বাকি আছে। এখনও গৃহপ্রাঙ্গণ কামিনী কুঞ্জে কোকিল প্রথমে ডাক ডাকে নাই। কিন্তু দোয়েল গীত আরম্ভ করিয়াছে। ... গোবিন্দলাল বাতায়ন পথ মুক্ত করিয়া ... তৎসমীপে দাঁড়াইলেন। অমনি তাহার পাশে ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা দাঁড়াইল।" এই বালিকাই গোবিন্দলালের স্ত্রী।

এর অব্যবহিত পরেই চাকরানি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে রোহিণীর চৌর্যাপরাধের কথা শুনে ভ্রমর গোবিন্দলালকে সে কথা শোনাল। গোবিন্দলাল একথা বিশ্বাস না করায় ভ্রমরও বিশ্বাস করল না। কেন-না – "গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।" এই যে প্রণয়, স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা, এই যে পীড়া এর পরিপ্রেক্ষিতে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের প্রত্যাখ্যানের চিত্রও স্পষ্ট।

এত সুখের মধ্যে গোবিন্দলালের জীবনে একটু অপূর্ণতা আছে। গোবিন্দলাল সৌন্দর্যপ্রিয়, সে কারণে তাঁর রূপতৃষ্ণা প্রবল। ভ্রমর তাকে সর্বপ্রকার সুখী করলেও তাঁর রূপতৃষ্ণা মেটাতে পারেনি। 'ভোমরা কালো।' কিন্তু রোহিণীর উচ্ছ্বলিত যৌবনের রূপরাশি তাঁর চোখে ধরা পড়বার আগে তিনি কখনও এর অভাব অনুভব করেননি। গোবিন্দলাল জীবনে প্রথম তার রূপের আকর্ষণ অনুভব করল। – "জলতল হইতে রোহিণীর মৃতকল্প দেহখানি তুলিয়া আনিয়া তিনি যখন উদ্যানস্থ পালঙ্কের উপর শোয়াইলেন। তখন তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য ও করুণ পরিণতি তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিল।" "গোবিন্দলাল যখন অধরে অধর

স্পর্শ করিয়া তাহার মুখে ফুৎকার দিলেন, তখন সেইখানেই তাঁহার জীবনের গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা হইল।" রোহিণী চলে গেলে গোবিন্দলাল রোদন করিতে লাগিলেন – নিজের ও ভ্রমরের ভবিষ্যৎ ভেবে।

গোবিন্দলাল এ সময় এমন এক ভুল করল যা এ অবস্থায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ভ্রমর বালিকা হলেও পতিপ্রাণা, সে রাত্রে গোবিন্দলালের মুখ দেখে তার সন্দেহ হল –" আজ কিছু হইয়াছে।" গোবিন্দলাল নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি বুঝেছেন – "তাঁহার এই পূর্ণযৌবন, ... রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। তাই 'প্রথম বর্ষার মেঘ দর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত' তাঁর মন রোহিণীকে ভুলবার উদ্দেশ্যে গোবিন্দলাল পিতার অনুমতি নিয়ে মহাল পরিদর্শনে যাত্রা করল।

সারা গ্রামে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর নামে কুৎসা রটতে শুরু করল। ঠিক তখন ভ্রমর গোবিন্দলালকে একটা পত্র লিখল। গোবিন্দলাল দেশে ফিরছে শুনে ভ্রমর পিত্রালয়ে চলে গেল। গোবিন্দলালের অভিমানের মাত্রা এতটাই বেড়ে গেল, তিনি – "মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা !... যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলিতে হইবে, তবে রোহিণীর কথাই ভাবি – নহিলে এ দুঃখ ভুলা যায় না।"

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর ভ্রমর আর গোবিন্দলাল আবার মুখোমুখি। কিন্তু এ মুখ এবার মুখোশ। ভ্রমরের নয়, গোবিন্দলালের। গোবিন্দলাল ভ্রমরের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় আগ্রহান্বিত নয়। তিনি উইলকে উপলক্ষ্য করে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য জিইয়ে রাখতে চায়। নিজের অপরাধের জন্য গোবিন্দলালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে, গোবিন্দলাল উইলের কথা তুলে তাকে ব্যঙ্গ করতে লাগল। যিনি একদিন মনে মনে শপথ করেছিলেন – "মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না।" তিনিই এখন ভাবছেন – "এ কালো ! রোহিণী কত সুন্দরী ! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব ! – আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা, সেই দিন ভাঙিয়া ফেলিব" – ভ্রমরের কাতর প্রার্থনার উত্তরে প্রকাশ্যে গোবিন্দলাল বলল, আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব !

রোহিণী চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য আসঙ্গলিপ্সা। যেখানে আসঙ্গলিপ্সার সাথে সংঘাত নেই, সেখানে সে সহজেই কর্তব্য বিছিয়ে নিতে পারে। গোবিন্দলাল যখন তার প্রাণরক্ষা করে বললেন, – পাপে কাহারও অধিকার নাই ! আত্মহত্যা পাপ ! – রোহিণী উত্তর করলো – আমি পাপ পুণ্য জানি না – আমাকে কেহ শিখায় নাই ! এই রোহিণী ও গোবিন্দলাল গ্রাম থেকে বহু দূরে গিয়ে একসঙ্গে থেকেছে। দেহ মিলনও করেছে। ভ্রমর যেমন গোবিন্দলালকে প্রতিবাদ জানিয়েছে তেমন গোবিন্দলালও রোহিণীর প্রতি প্রতিবাদের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। গোবিন্দলাল

রোহিণীকে গুলি করে মেরেছে। স্বামী হত্যাকারী। এ কথা ভ্রমর কোনোক্রমেই ভুলতে পারেনি। এ জন্য ছয় বৎসর অদর্শনের পর গোবিন্দলাল যখন আশ্রয় ভিক্ষা করে পত্র লিখল, ভ্রমর তার উত্তরে জানাল – আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব।... আপনার সঙ্গে আমার ইহ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভ্রমর রোহিণীকে প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে স্বীকার না করলেও গোবিন্দলালকে নিয়ে তাদের দ্বন্দ্বই কৃষ্ণকান্তের উইলের আখ্যানবস্তু, রোহিণী মরল, ভ্রমরও মরল। ভ্রমরের শোকে গোবিন্দলাল যখন উন্মাদপ্রায়, যখন তার শরীর মন দুই-ই অবসন্ন, তখন ইন্দ্রিয়বিভ্রম বশত রোহিণীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ এবং পরে "মুগ্ধাবস্থায় ... জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরমূর্তি দর্শন ও তাহার বাণী শ্রবণ গোবিন্দলালের মানস রাজ্যে রোহিণী ও ভ্রমরের প্রভাবের প্রতীক। রোহিণীর প্রদর্শিত পথ মুক্তির পথ নহে, আত্মহত্যায় প্রায়শ্চিত্ত হয় না। ভ্রমরের কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে আশার বাণী শোনাল – "মরিবে কেন ? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে ? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।"

রূপ ক্ষণিকের, রূপের আকর্ষণ আরও ক্ষণিকের। তাই রোহিণীর বিজয়গৌরব পরাজয়ের লাঞ্ছনায় পর্যবসিত হল। অপরদিকে ভ্রমরের ঐশ্বর্য অপার্থিব, মৃত্যুতে ভ্রমর তাই রোহিণীর ওপর জয়ী হল। একই সঙ্গে গোবিন্দলালের প্রেমের প্রতিবাদও জানাল নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন – "আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে 'চোখের বালি' উপন্যাসটি আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন্ ইশারা এসেছিল আমার মনে সে প্রশ্নটা দুরূহ। সবচেয়ে সহজ জবাব হচ্ছে ধারাবাহিক লম্বা গল্পের উপর মাসিক পত্রের চিরকাল দাবি নিয়ে।"

'চোখের বালি' উপন্যাসে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্ক সাংসারিক নানা জটিলতার সৃষ্টি করলেও প্রেম নামক গভীর অনুভূতি সেখানে প্রায় নেই বললেই চলে। বরং বিনোদিনী-বিহারীর প্রেমানুভূতির উন্মেষ এবং তার সযত্ন লালনই বড়ো কথা। কারণ এর দ্বারাই বিনোদিনীর উত্তরণ ঘটেছে। এরই ফলশ্রুতি দেখা গেছে কাহিনির শেষে ভোগের পরিবর্তে বিনোদিনীর ত্যাগকে গ্রহণ করার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের বিশ্বাসের সঙ্গে এটি সর্বাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্বামী মারা গিয়ে বিনোদিনীকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ করে দিল। সে এখন ছায়াহীন প্রান্তরে একাকী দাঁড়াতে বাধ্য হল। জীবনের যত জটিলতা, যত প্রলোভন, যা কিছু সমস্যা সব এসে দাঁড়িয়েছে সরাসরি তারই কাছে। তাই সে উদ্দীপ্ত হয়েছে, আকৃষ্ট হয়েছে, সংঘর্ষে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। কিন্তু কখনোই তাকে জড় পদার্থ মনে হয়নি। তার মায়ের বাল্যসখা রাজলক্ষ্মী যখন বারাসাতের বাড়িতে গিয়ে তার দেখা পেলেন এবং রাজলক্ষ্মীর সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নিলে রাজলক্ষ্মী

বিনোদিনীকে বাড়ি নিয়ে আসে।

মহেন্দ্রের চিঠি এসে পৌঁছানোর পর বিস্ফোরককে যেন অগ্নি সংযুক্ত হল। দাম্পত্য লীলার নানা খুঁটিনাটিতে ভরা সেই চিঠি রাজলক্ষ্মী তাকে পড়তে দিলে সে একেবারে তৃপ্তি পেল না। নিজের কাছে তাকে রেখে বারবার সংগোপনে পড়েছে। এ যেন নবদম্পতির ঘরে গোপনে উঁকি দেবার মতো। চিঠি পড়তে পড়তে – "তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।"

দেশের বাড়ি থেকে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে বিনোদিনীর মহেন্দ্রের সংসারে প্রবেশ করল তখন তার মতো অক্লান্ত সেবিকার হাতে সেবা পাবার লোভ যতটা ছিল, অকর্মণ্য পুত্রবধূর প্রতি মহেন্দ্রের অতিশয় মনোযোগে ঈর্ষার জন্য তাকে শায়েস্তা করবার আকাঙ্ক্ষাও ছিল না এমন নয়। মহেন্দ্রের কাছে আশা যেমন খেলার পুতুল। পছন্দ হওয়া মাত্র সে ন্যায় অন্যায়ের তোয়াক্কা না করে আশাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছে। বিনোদিনীর আগমনের আগে পর্যন্ত দাম্পত্যলীলায় মশগুল থেকে আজন্মের প্রিয় মাকে পর্যন্ত অবহেলা করেছে। অথচ পরে বিনোদিনীর নেশায় আশাকে অবহেলা করেছে, কিন্তু মহেন্দ্রের প্রতি আশার ঐকান্তিক অনুরাগের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এর কিছুটা মহেন্দ্রের প্রাথমিক পর্যায়ের অতি ঘনিষ্ঠ, উষ্ণ আচরণের জন্য, আর অনেকটাই ভারতীয় নারীর চিরকালের লালিত পতিপ্রেমের সংস্কারের জন্য। এই সংস্কারের জন্যই হয়তো বিহারীর অপাপবিদ্ধ মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধা আশাকে অস্বস্তিতে ফেলত এবং সে মাঝে মাঝেই বিরক্তি প্রকাশ করত।

'চোখের বালি' বিনোদিনীর গুণমুগ্ধ আশা চেয়েছে তার স্বামীর সঙ্গে সখীর একটা ঘরোয়া সম্পর্ক স্থাপিত হোক। কিন্তু তাকেই শিখণ্ডি রেখে দুই নারী-পুরুষ যে নিজেদের মধ্যে অবৈধ আকর্ষণের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে – এ কথা আঁচ করে অযাচিতভাবে তাদের মাঝখানে ঢুকে পড়তে চেয়েছে। আশার প্রতি বিহারীর সশ্রদ্ধ মনোযোগ বিনোদিনী সহ্য করতে না পেরে ব্যঙ্গ কটাক্ষ করেছে। কৌতুকে অংশগ্রহণ করলে আসল কথা বলতে বিহারী দ্বিধা করেনি। মহেন্দ্রকে সে বলে – "মহিনদা, নিজের সর্বনাশ করিতে চাও করো – বরাবর তোমার সেই অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে সরলহৃদয়া সাধ্বী তোমাকে একান্ত বিশ্বাসে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার সর্বনাশ করিয়ো না। এখনো বলিতেছি, তাহার সর্বনাশ করিয়ো না।"

যে আশাকে একবার দেখামাত্র বিবাহ করেছিল মহেন্দ্র, সেই মহেন্দ্রর আশার প্রতি মুগ্ধতা আর নেই, রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন, – "মহেন্দ্রের সোহাগের মধ্যে বেসুর লাগিতেছিল – কতকটা মিথ্যা বাড়াবাড়ি, কতকটা আত্মপ্রতারণা।"

বিনোদিনীর প্রতি উৎসাহ যে ক্রমশ বৃদ্ধি হয়ে চলেছে তার প্রমাণ, আশার প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টি এখন সয়ে গেছে, এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট কথা বলেছেন, – "মহেন্দ্র প্রণয়ের উত্তপ্ত বাসরশয্যার মধ্যে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে

সংসারের কাজকর্মের প্রতি একটু সজাগ হইয়া পাশ ফিরিল।" একবার বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপের পর পুনরায় আলাপ চলবে, আশা এই ইঙ্গিত দেওয়ার পর মহেন্দ্র বলেছে – "এখন বুঝি বরাবরই এমনি চলিবে।" তার এই আপাত বিরক্তির কারণ – "মহেন্দ্র মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বিনোদিনী এখন হইতে কোনো-না কোনো ছুতায় দেখা দিবেই।" সেই জন্য মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে স্ত্রীকে আচ্ছা, তোমার অযোগ্য এই স্বামীটিকে চোখের বালির কেমন লাগিল।

আশার সারল্যের সুযোগ নিয়ে মহেন্দ্র বিনোদিনীর সঙ্গে নিবিড় মানসিক সান্নিধ্য গড়ে তুলেছে। যতবার সে ভেবেছে বিনোদিনী বুঝি এইবার তার কাছে এসে প্রেমে আপ্লুত হয়ে পড়বে, ততবার সে আঘাত পেয়েছে, আর যতবারই আঘাত পেয়েছে ততবারই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত এই ধারণা তার মনে বদ্ধমূল ছিল – "আমি সর্বাংশেই বিনোদিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবু আজ আমি সর্বপ্রকার হীনতা ও লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়া ঘৃণিত ভিক্ষুকের মতো তার পশ্চাতে অহোরাত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছি। নিদারুণ যন্ত্রণায় বিনোদিনীকে সে এমন কথা পর্যন্ত বলতে পেরেছে – "যতদিন তুমি না মরিবে ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে না – আমিও নিষ্কৃতি পাইব না। আমি আজ হইতে ভগবানের কাছে সর্বান্তকরণে তোমার মৃত্যু কামনা করি। ... আমাকে ছুটি দাও। আমার মা কাঁদিতেছেন, আমার স্ত্রী কাঁদিতেছে তাঁহাদের অশ্রু আমাকে দূর হইতে দগ্ধ করিতেছে। তুমি না মরিলে, তুমি আমার এবং পৃথিবীর সকলের আশার অতীত না হইলে, আমি তাঁহাদের চোখের জল মুছাইবার অবসর পাইব না।"

আশা ভুলতে পারেনি এবং ক্ষমা করতে পারেনি বিনোদিনীকে। আশার মুখ চোখের অবস্থা দেখে অন্নপূর্ণা তাকে পুরনো কথা মনে না রাখার উপদেশ দিলে আশা বলেছে, – "মাসিমা, আমি মনে কিছু পুষিয়া রাখিতে চাই না, আমি ভুলিতেই চাই, কিন্তু ভুলিতে দেয় না যে।" স্পষ্টই বোঝা যায়, বিনোদিনীকে মেনে নিতে সে পারেনি, কিন্তু অন্নপূর্ণার কথায় ওপরে ওপরে বিনোদিনীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সামনে সামনে ভালোবাসার ভান দেখালেও কিন্তু পিছনে দেখাতে পারেনি। "বিনোদিনীর সাজা পান অনেক সময়ে শিষ্টতার খাতিরে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু আড়ালে তাহা ফেলিয়া দিয়াছে।"

মহেন্দ্র প্রথমে আশার জন্য রাজলক্ষ্মীকে, পরে বিনোদিনীর জন্য আশাকে, বিনোদিনী এবং আশার জন্য বিহারীকে প্রায় ত্যাগ করেছে। মহেন্দ্র নিজের প্রয়োজনে যেমন সকলকে নিজের সুবিধামতো গ্রহণ করেছে। প্রয়োজন শেষে আবার বিদায়ও দিয়েছে। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই মহেন্দ্রকে উচিত শিক্ষাও দিয়েছে।

পল্লীসমাজ উপন্যাসের আলোচনার সূত্রপাতে প্রাসঙ্গিক উক্তি একবার স্মরণ করা যেতে পারে। "পল্লীসমাজ" (১৯১৬) সম্পর্কে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, –

"পল্লীসমাজ বলে আমার একখানা ছোট বই আছে, তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালোবেসেছিল বলে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে।

একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড়ো দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা কেউ থাকবে না। মরণ বাঁচনের কথা বলা যায় না। প্রত্যেক স্বামীর পক্ষে ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয় কিন্তু আর একটা দিকও তো আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভালো হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু সমাজে সাধারণের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে, এত বড়ো দুটি মহাপ্রাণ নরনারী জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। ... সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানি নে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত, নরনারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিশে আছে, মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসন দণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নরনারীর ভালোবাসার বেলা।" ('সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' নিবন্ধ। ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখায় সভাপতির অভিভাষণ। ১৯২৪। 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থভুক্ত। ভাদ্র ১৩৩৯/১৯৩২)।

পল্লীসমাজ উপন্যাসে বাস্তবতা এবং অবাস্তবতা, দুই-ই আছে। উপন্যাসের মূল কথা দুটি রমা ও রমেশের প্রণয়, গ্রামসমাজে তার বাধা প্রাপ্তি ও পরিপুষ্টি এবং রমেশের গ্রামোন্নতি – চিন্তার বাস্তব রূপায়ণের পথে গ্রামসমাজের বাধা।

কুঁয়াপুর গ্রামের সমাজ রমেশের প্রতি রমার ভালোবাসাকে কীভাবে চেপে মারতে চায় তার প্রমাণ উপন্যাসে আছে। উপন্যাসের সূচনায় দেখি রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করতে বেণী ঘোষালের ষড়যন্ত্র ও বিধবা রমাকে সেই ষড়যন্ত্রের অংশীদার করা, রমা বেণীর থেকে চিন্তায় অনেক এগিয়ে রমেশের ক্ষতি করার জন্য – রমা হাসিল। কহিল, বড়দা, বাবা বলতেন আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখনও রাখিস নে মা। তারিণী ঘোষাল (রমেশের বাবা) জ্যান্তে আমাদের কম জ্বালা দেয়নি – বাবাকে পর্যন্ত জেলে দিতে চেয়েছিল। আমি কিছুই ভুলিনি বড়দা, যতদিন বেঁচে থাকব ভুলব না – রমেশ সেই শত্রুরই ছেলে তো।

এই শত্রুরই ছেলেকে রমা ভালোবেসেছে অন্তর থেকে আবার কখনো-কখনো প্রতিবাদও জানিয়েছে জোরের সঙ্গে, চেয়েছে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করতে, মুক্ত করে রাখতে চেয়েছে নিজের প্রাণপাখিটিকে। কিন্তু যত মুক্ত করতে চেয়েছে তত যেন মনে মনে সে বন্ধন আরো কঠিন হয়েছে। তারকেশ্বরের দুধ-পুকুরের সিঁড়ির উপর কুড়ি বর্ষীয়া রমাকে দেখে রমেশ চোখ ফেরাতে পারেনি। একি ভীষণ উদ্দাম যৌবনশ্রী ইহার আর্দ্র বসন বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল তাহার মুখ, গঠন, প্রতি পদক্ষেপ পর্যন্ত রমেশের পরিচিত, অথচ বহুদিন রুদ্ধ স্মৃতির কবাট কোন মতেই তাহাকে পথ ছাড়িল না।

১০ নম্বর পরিচ্ছেদে দেখা যায় রমেশের থাকার কোনো জায়গা নেই খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। সে জন্য রমা নিজের গৃহে নিয়ে যাচ্ছে রমেশকে। কেবল একজন মানুষের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে কি কোনো মহিলা তাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রান্না করে খাওয়ায় ? মনে হয় না। সুতরাং রমা রমেশকে যে কতটা ভালোবাসে এটা তার প্রমাণ। রমার সতরঞ্চি পাতা 'শয্যায় শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া রমেশের মনে হইল, তাহার এই তেইশ বর্ষব্যাপী জীবনটা এই একটা বেলার মধ্যে যেন আগাগোড়া বদলাইয়া গেল।'

'আমার সমস্ত জীবনটা যেন তুমি এই একটা বেলার মধ্যে আগাগোড়া বদলে দিয়েচে। এমন করে আমাকে কেউ কখনো খেতে বলেনি, এত যত্ন করে আমাকে কেউ কোনোদিন খাওয়ায় নি। খাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, আজ তোমার কাছ থেকে এই প্রথম জানলাম রমা।' যে রমাকে রমেশ এত ভালোবেসেছ, এগারো পরিচ্ছেদে সেই রমা নিজেদের তিন ঘরের দুশো টাকা বাঁচানোর জন্য, একশো বিঘার ধেনো জমির জল বার করে দিলে দুশো টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে সেজন্য রমা কখনই রাজি হয়নি। এখানে রমার নীচু মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রমেশ বেণীর অনুমতি না পেয়ে যখন রমার কাছে বাঁধ কাটার অনুমতি নিতে এসেছে, রমা মৃদু কণ্ঠে বলল, না, 'অত টাকা লোকসান আমি করতে পারব না।' দুটি মানুষের আনন্দ ও মধুময় জীবনের পরিবর্তন একমুহূর্তে শেষ হয়ে গেল। সব যেন ভেঙে চুরমার। "রমেশ জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, রমা মানুষ খাঁটি কি না, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। কিন্তু তোমাকে আমি এমন করে ভাবিনি। চিরকাল ভেবেচি তুমি এর চেয়ে অনেক উঁচুতে, কিন্তু তুমি তা নও। তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল। তুমি নীচ, অতি ছোটো।"

দুটি মানুষের প্রেম প্রত্যাখ্যানের প্রতিবাদের পারদ এতটাই চড়েছে যে, কটু কথা বলতে আজ আর কারোর মুখে বাঁধে না। কেউ যেন কারোর কাছে এতটুকু ধরা দিতে চায় না। সমাজের চাপে দূরে সরে যাওয়ার জন্য কি এই বিবাদগুলো নিজেদের তৈরি ? 'রমেশ তেমনি শান্ত তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল আমার দুর্বলতা কোথায় সে তোমার অগোচর নয় বটে। কিন্তু সেখানে পাক দিয়ে আর এক বিন্দু রস পাবে না, তা বলে দিয়ে যাচ্ছি।'

মুখে রমার বাঁধ কাটার অনুমতি না থাকলেও মনে মনে নিশ্চয়ই ছিল। কেন-না ভালোবাসা যে কখনও মরে না। জোর করে মারা যায় না। তাই বাড়ি ফিরে রমা সারারাত্রি ভেবেছে তারকেশ্বরে সামনে বসে নিজের প্রিয়তমকে খেতে দিয়েছিল। সেই সুপুরুষ দেহের মধ্যে এত তেজ এত মায়া কীভাবে বাস করে ভাবতে ভাবতে রমার দু-চোখ জলে ভাসল।

নারী আর পুরুষ আবার অনেকটাই কাছাকাছি চলে এসেছে। যতীনকে ছোটদা বলতে শিখিয়েছে রমা। যতীনের হাত ধরে রমা রমেশের বাড়ি উপস্থিত। রমেশ মৃদু ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল – 'তোমাকে ভালোবাসতাম রমা। আজ আমার

মনে হয়, তেমন ভালোবাসা বোধ করি কেউ কখনো বাসেনি।' এই সময় পুলিশ তল্লাশি করতে এলে রমাকে খিড়কির পথ দিয়ে বাইরে বার করে দিয়েছে। যেন তার মনের মানুষের কোনো সমস্যা না হয়, তাকে যাতে কোনো বিপদে পড়তে না হয়।

রমেশ যতই রমার নিকটবর্তী হতে চেয়েছে রমা ততই নিজের দ্বিধা ও সংকোচের অন্তঃপুরে আত্মগোপন করেছে, অনেক সময় দুর্বলতা ঢাকার জন্য রমেশকে বিনা কারণেই আঘাত করেছে। একমাত্র ভৈরব আচার্যের বাড়িতে রমার সমস্ত আড়াল ঘুচে গিয়েছিল। তাই সকলের সামনে রমেশের চেপে তাকে অনায়াসে বলতে শোনা গেছে, "এত লোকের মাঝখানে তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাই।"

সমগ্র উপন্যাস জুড়েই দেখা যাবে যে, রমেশ যতবারই রমার অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেছে ততবারই সে পেয়েছে অকারণ আঘাত এবং অপমান। আবার যখনই সে অভিমানে দূরে সরে গেছে তখনই আবার রমা যেন তার হৃদয়ের অনেক কাছাকাছি চলে আসে। আসলে দীর্ঘকাল গ্রামের বাইরে থাকায় পল্লিসমাজের প্রকৃত চেহারাটি রমেশের জানা ছিল না। কিন্তু রমা জানত যে এই হৃদয়হীন সমাজ কোনো অবস্থাতেই বিধবার প্রেমকে সমর্থন করবে না। রমেশের সঙ্গে তার বিবাহ তো দূরের কথা। তাই অন্তরের বাসনা ক্রমাগত চেপে রেখে সে নিজেকে নিঃশেষ করেছে। এ যেন তার সংগোপনে আঘাত ও অসম্মান সহ্য করার পালা। তার শরীর মন ভেঙে যাওয়ার আসল কারণটি একমাত্র বিশ্বেশ্বরী ধরতে পেরেছিলেন। তাই রমাকে নিয়ে তীর্থে যাবার সময় তিনি রমেশকে বলেছিলেন যে রমার মত দুঃখিনী সমস্ত গ্রামে আর কেউ নেই। আর সে-ই রমেশের সবচেয়ে বড়ো 'মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী'। রমার সামনে রমেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হয়েছে, কোথাও তার সমর্থন ছিল – কোথাও ছিল না। কিন্তু সর্বত্রই তার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। বেণীকে উপেক্ষা করে রমেশের কাছে তার যাওয়া সম্ভব হয়নি। আবার বেণীকে পুরোপুরি সে মেনে নিতে পারেনি। তাই রমেশের সঙ্গে কখনো-কখনো ভালোবাসায় যেমন জড়িয়েছ তেমনি পরমুহূর্তে প্রতিবাদও করেছে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় আধুনিক জটিল জীবনবোধের যে প্রতিফলন ঘটেছে, বলাবাহুল্য তার অনেকটাই উপন্যাসের নায়ক শশী-চরিত্রের দর্পণে। এদিক থেকে 'চতুরঙ্গ'-এর নায়ক শচীশ বা 'অন্তঃশীলা'-র খগেনবাবুর সঙ্গে শশীর একটা ভাবসাদৃশ্য হয়তো অনুভব করা চলে। জীবনের তাৎপর্য সম্পর্কে গূঢ় জিজ্ঞাসা এদের সকলের চেতনাকেই তীব্রভাবে বিক্ষুব্ধ আলোড়িত করেছিল, এদের গোটা জীবনটাকেই বিদ্ধ করেছিল এক কঠিন যন্ত্রণায়।

কুসুমের সঙ্গে শশীর সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। কুসুমের মিষ্টি কথার মধ্যে শশী একটা ছন্দ অনুভব করে। তাকে অনেক গোপন কথা বলে। কুসুমের চাউনি, তার নিবিড় আকাঙ্ক্ষা শশী উপভোগ করে। প্রশ্রয়ও দেয় কিন্তু স্বীকৃতি

দেয় না। কুসুম শশীর বাড়ি আসবার উত্তেজনায় যে জায়গায় দাঁড়ায়, আবেগে ও উত্তেজনায় ফুল গাছটি যে মাড়িয়ে দিচ্ছে সে খেয়াল থাকে না। শশীর কাছে আসবার একাগ্রতা, অধীরতা ও উত্তেজনার মধ্যে নিজেকে সংযত করতে গিয়ে গাছের চারাটি তার চোখে পড়ে না। আর মনেও থাকে না। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে ভালোবাসার পাত্রকে দেখবার একটা অভ্যাস জন্মায়। মনোবিজ্ঞানে একে বলে Love habit।

মতি সম্পর্কেও শশীর একটা মোহ ছিল। যখন কুমুদ মতিকে বিয়ে করতে চাইল তখন ঈর্ষায় জর্জরিত হয়ে কুমুদকে এই গ্রাম্য নোংরা মেয়েকে বিয়ে করে সারা জীবন পস্তাতে নিষেধ করে। শেষ পর্যন্ত নিজে বিয়ে করবে স্থির করে। কুসুমের যুক্তিতে শশী কুমুদের সঙ্গে মতির বিয়ে দিতে রাজি হয়। মতি বিয়েতে রাজি আছে জেনে শশী দমে যায়। কুমুদ তাকে বিয়ে করার পর মতির কোনো ছাপ তার মনে নেই। মতির প্রতি তার যে মোহ ছিল এ কথা এ স্মৃতিও তার মনে নেই।

কুসুম প্রথম থেকেই শশী ডাক্তারের প্রতি আকৃষ্ট। মতির জ্বরের উপলক্ষ্যে সে শশী ডাক্তারেক বার বার বাড়ি আসতে বলে। সে পরস্ত্রী হলেও আকারে ইঙ্গিতে নিজের ব্যাকুল মনোভাব শশীকে জানাতে দ্বিধা করেনি। কারোর কোনো বকাবকি সে কানে তোলে না। "কাজ করিতে ভালো না লাগিলে খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়া তাল বনে তালপুকুরের ধারে ভূপতিতত তাল গাছটার গুঁড়িতে চুপচাপ বসিয়া থাকে।" তালপুকুরের ধারে শশীর সঙ্গে সান্নিধ্যের জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে।

কুসুমের সঙ্গে শশীর সম্পর্ক কখনোই সহজ হয়নি। কুসুমের ছলনা, অভিমান, 'ঈর্ষা' শশীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশার মধ্য দিয়ে যে সম্পর্ক দানা বাঁধছিল শশী জানত এই ছেলেখেলা একদিন শেষ হবে। প্রবলতর জীবনসমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে দুজনকেই। শশীর ঘরে বৃষ্টিতে ভিজে কুসুম যখন ঔষধ নিতে এসেছে, তখন কুসুমের যে অন্তরমথিত উক্তি – "সইতে পারি না ছোটবাবু।" কুসুমের জন্য শশীর অন্তরে দুর্বলতা থাকলেও বন্ধু পরানের বিশ্বাসকে সে কোনোদিনই আঘাত করতে চায়নি। কুসুমের কাছ থেকে সে যত অবহেলা পেয়েছে। যত বেশি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ততই তার প্রতি শশীর আকর্ষণ তীব্র হয়েছে। জীবনের সমস্ত বন্ধুরতা সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে হৃদয় গভীরে কুসুমের জন্য একটা স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কুসুমের সঙ্গে দেখা না হলে শশীর অস্থিরতা বাড়ে। নিজেকে তার অসহায় মনে হয় – "একদিন খুব ভোরে বাড়ির সামনে রাস্তায় নামিয়া দাঁড়াইতেই শশীর চোখে পড়িল কুসুমও নিজের বাড়ির সামনে পথে দাঁড়াইয়া আছে। কুসুমও যে শশীকে দেখতে পাইয়াছে তা বোঝা গেল। কই, হাতছানি তো দিল না কুসুম। আগাইয়া তো আসিল না.. শশী একটু দাঁড়াইয়া রহিল। খোলা মাঠে বিলীন কায়েত পাড়ার নির্জন রাস্তাটি আজও শশীর জীবনে রাজপথ হইয়া আছে, যে তাকে যতটুকু নাড়া দিয়াছে এই পথে আজ শুধু কুসুম

হাঁটে।" কুসুমের মনে শশীর জন্য অনন্ত কৌতূহল সঞ্চিত হয়ে আছে এমন একটা রোমান্টিক বিশ্বাস শশীর মনে ছিল।

শশীর কাছে শরীরের চেয়ে মনের মর্যাদা অনেক বেশি। কুসুম কিংবা মতিকে সে যে ভালোবেসেছে তার মধ্যে দৈহিক কামনার তীব্রতা নেই। ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তার মধ্যেও শরীর ও মনের, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সে পর্যায়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত শারীরিক অসুস্থতা তার চেতনাকে করে তুলেছিল তীব্র। 'দিবারাত্রির কাব্যে'র বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে এই দেহ-মনের দ্বন্দ্বের পরিচয় রয়েছে। শশীর মধ্যেও সেই ভাবনার প্রতিরূপ লক্ষ করা গেছে। চাঁদের আলোর পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ প্রকৃতির বুকে শশীর একান্ত সান্নিধ্যে থাকা কুসুম বলেছে – আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটোবাবু ? শরীরের কথা শশীর প্রবলভাবে আঘাত করেছে, শশীর কণ্ঠে প্রবলভাবে উচ্চারিত হয়েছে – "শরীর ! শরীর ! তোমার মন নাই কুসুম।" আর কুসুমের দৃষ্টিতে শশীর যে রূপ সত্য হয়ে উঠেছে – "আপনি দেবতার মত ছোটবাবু।"

একদিন শশী সত্যি সত্যি কুসুমের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কুসুমকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথাও বলে কিন্তু কুসুমের যে প্রেম সাত বছর আগে জীবিত ছিল, শশীর কাছ থেকে পূর্ণ সাড়া না পাওয়ায় তা কবে যে নিঃশেষ হয়ে গেছে কুসুম তা নিজেও জানে না। "আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যে দিন আপনার সুবিধা হবে ডাকবেন, আমিও ওমনি সুড় সুড় করে করে আপনার সঙ্গে চলে যাব।" শশী অধীরভাবে বলল, "একদিন কিন্তু যেতে" কুসুম স্বীকার করে বলল তা যেতাম ছোটবাবু স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক ইশারা করে ডাকলেই ছুটে যেতাম, চিরদিন কি একরকম থাকা যায়। মানুষ কি লোহায় গড়া যে চিরকালই সে এরকম থাকবে বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়া করে বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।" কুসুম আরো বলেছে – "লাল টকটকে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না?" এখানে শশীর ভালোবাসা যখন জেগে উঠল, ব্যাকুল হল, অদম্য হয়ে উঠল তখন কুসুমের ভালোবাসা মরে গেছে। তাই শশীর জাগ্রত ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে কুসুম চিরকালের মতো বাপের বাড়ি চলে গেল। বিদায় নেবার মুহূর্তে কুসুম যখন তাকে বলেছে – "বিদায় নিতে এলাম ছোটবাবু। দোষটোষ যা করেছি মনে রাখবেন নাকি?" উত্তরে শশী বলেছে -- "রাখব না? দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ, তোমার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তুচ্ছ কথাটি পর্যন্ত কোনদিন ভুলতে পারব না বৌ।" শশীর হৃদয়-বাসনার উত্তাপ স্মৃতির স্নিগ্ধতায় এখানে বেদনাতুর হয়ে উঠেছে। বুকচাপা গভীর যন্ত্রণার এ এক সংযত আধুনিক রূপ।

"দিবারাত্রির কাব্য আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কয়েক বছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্তন করে গত বছর (১৩৪১ বঙ্গাব্দ) বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি। দিবারাত্রির কাব্য

পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয়, বইখানি খাপছাড়া, অস্বাভাবিক – তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনি। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতকগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection মানুষের এক-এক টুকরো মানসিক অংশ।"

প্রথানুগত্য, আচারসর্বস্বতা, কুসংস্কার-নির্ভর, অতীতমুখী বদ্ধ সমাজ মানবচরিত্র ও অভিজ্ঞতাকে কতকগুলো বিকৃত আদর্শ পঙ্গু করে রাখে। আবার পাশ্চাত্য সমাজ থেকে আগত গৌরবের উজ্জ্বহ আলোকে আলোকিত রোমান্টিক ভাবধারাকে অভিজ্ঞতার বাস্তবভিত্তিকে স্বীকার করতে চায় না। পঙ্গু আদর্শ ও বাস্তবতার প্রতি অবিশ্বাস আমাদের চরিত্রের ভিত্তিকে অনেকটাই সারাজীবনের মতো অন্ধ করে রাখে। এ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হেরম্ব। সমগ্র কাহিনির মূল ভাবনার অন্যতম নিয়ন্ত্রক সে। হেরম্ব বুদ্ধিজীবী। কলেজে অধ্যাপনা করে। তার স্ত্রী উমা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। নিজের শরীর সম্পর্কে তার মমত্ববোধ যথেষ্ঠ। তার প্রেমের উপলব্ধি রোমান্টিক ভাবনাকে স্পর্শ করে না। মানুষের সমস্ত কোমল উপলব্ধি হেরম্বের কাছে শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ মাত্র। বদহজম আর ভালোবাসার লক্ষণগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য সে দেখতে পায় না। সে জটিল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত – সাধারণ সুস্থ মানুষ সে নয়। জীবনে সে এত বেশি পাক খেয়েছে যে তার মাথা সর্বদাই ঘোরে। স্বাতন্ত্র্য আছে তার ভালোবাসার মধ্যে। হেরম্ব সম্পর্কে সুপ্রিয়া বলেছে – ''সৃষ্টিছাড়া ভালোলাগা নিয়েই তো কারবার আপনার।" ভালোবাসা তার কাছে যুক্তি-বুদ্ধির অতীত কোনো অলৌকিক অনুভূতি নয়।

হেরম্ব বারো বছর বয়সে ষোলো বছরের মালতীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। ছেলেদের বারো বছর আর সে যুগের মেয়েদের ষোলো বছরের মধ্যে অনেক তফাৎ। মালতী সন্দেশ খাইয়ে এই কচি প্রেমিককে শান্ত রেখেছিল। অনাথ ও মালতীর প্রেমের ব্যাপারে সে জানত ও কৌতূহলী ছিল। একদিন রাতে অনাথ ও মালতী কূলত্যাগ করে, হেরম্ব তা নিয়ে অনেক কল্পনা করেছে। প্রেমের রহস্য সম্পর্কে কল্পনা, বাস্তব, ইচ্ছাপূরণজাত দিবাস্বপ্ন মিলে তার বয়সের এই চিন্তা-উপভোগ ও মালতী ও অনাথ সম্পর্কে একটা কৌতূহল তার থেকেই গিয়েছিল। তাই অনাথের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুরীতে কেবল মালতী বৌদিকে দেখতেই সে নির্লজ্জের মতো অনাথের ভদ্রতার উপর জুলুম করে আশ্রমে এল।

নায়িকা হেরম্বেরই প্রবঞ্চিতা প্রেমিকা, বর্তমানে রূপাইকুড়ার দারোগা অশোকের স্ত্রী হিসেবে অভিনয় করতে হচ্ছে। সুপ্রিয়ার চোখের জলের সামনে দাঁড়িয়ে ভীত হেরম্ব স্বীকার করেছে, – "তোর ভালোর জন্য যতটুকু বলার দরকার তার বেশি আমি কিছুই বলিনি।" কিন্তু বিবাহিত জীবনের পাঁচটি বছর

হেরম্বের অদর্শনে কাটিয়েও যে তাকে মনের মধ্যে অনির্বাণ দীপশিখার মতো জ্বেলে রেখেছে, তার কাছে এ কৈফিয়ৎ অর্থহীন শোনাবেই। সে শরৎচন্দ্রের প্রবল-প্রভাবাশ্রিত বাংলা উপন্যাসের নায়িকা হয়েও স্বামীর ঘরে দাঁড়িয়ে হেরম্বের মুখের উপর তীব্র প্রতিবাদ করে বলে – "না বললে আমার মন্দটা কি হত স্কুলে পড়েছিলাম, লেখাপড়া শিখে চাকরি করে স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতাম। আপনি আমাকে তা করতে দেননি কেন হেরম্ব মাথা নেড়ে বলল, তোর সহ্য হত না, সুপ্রিয়া।' 'সুপ্রিয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করল কেন হত না? পাঁচ বছর এই বুনো দেশে পড়ে থাকা সহ্য হচ্ছে, পেট ভরাবার জন্য পরের দাসীবৃত্তি করছি, গোরু বাছুরের সেবা করে আর ঘর গুছিয়ে জীবন কাটাচ্ছি, – ঝিমিয়ে পড়েছি একেবারে। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালে আমার সহ্য হত না কেন?'

সুপ্রিয়া সংসারে এসে বুঝতে পারল, প্রেম অল্পস্থায়ী হলেও সুপ্রিয়া মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুপ্রিয়ার নালিশ, অভিযোগ, ভালোবাসার নানা আবেদন, দেহ সান্নিধ্যে আসবার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, সুপ্রিয়ার তপ্ত-প্রেমের প্রচ্ছন্ন উত্তেজনায় হেরম্ব শুধু সাড়া দিল না তা নয়, কঠিন অভিভাবকের মত মৌন শাসনে প্রায় অস্বীকার করল। একসময় সুপ্রিয়া ফিটও হল। ফিটের পর গভীররাতে দুর্বল শরীরে হেরম্বের বিছানার কাছে এসে বিছানায় বসবাস অনুমতি চাইল। অসুস্থ ও দুর্বল সুপ্রিয়াকে বিকারের রোগী ভেবেও বসার অনুমতি দিতে পারত। কিন্তু রাজি হল না সে।

সুপ্রিয়া তার জীবনে আবর্ত সৃষ্টি করতে পারবে না, কারণ তার মতে, ভালোবাসা ও বদহজমের লক্ষণগুলির মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। সুপ্রিয়া জানে, তার বাসায় হেরম্বের অবস্থানের আয়ু চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তবু আবেশক্লিষ্ট সুপ্রিয়া চিন্তা করে হেরম্ব চিরদিনের মতো চলে গেলে সে বেঁচে থেকে কী করবে। হেরম্বের প্রতি অভিমান বিদ্রোহে রূপান্তরিত – "এতদিন আশায় আশায় কাটিয়েও যে কষ্টটা আমি পেয়েছি, ও তার কি বুঝবে ! ছাই সংসার, ছাই ভালোমন্দ ! ছাই আমার মঙ্গল অমঙ্গল ! একজনের অদর্শন সইতে না পেরে আমার যদি শুধু অসহ্য যন্ত্রণাই হতে থাকে, জগতে কিসে তবে আমার মঙ্গল হওয়া সম্ভব শুনি? পাঁচ বছর পরীক্ষা করেই তো বোঝা গেল এসব আমার পোষাবে না। কলের মত হাত পা নেড়েছি, শুয়েছি, বসেছি, হেসেছি পর্যন্ত, কিন্তু আমি তো জানি কি করে এতকাল আমার কেটেছে, দিনের মধ্যে কতবার আমার মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে সাধ গিয়েছে।"

চিন্তাভাবনার সবকিছু জটিলতা ফেলে দিয়ে, কাব্য ও কল্পনার সবকিছু লাবণ্য ও সুষমাকে বিসর্জন দিয়ে হেরম্ব প্রেমকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পেতে চায়। কিন্তু এই আধেয়কে পেতে হলে উপযুক্ত আধার চাই – হেরম্বের চোখে আনন্দই সেই আধার। আনন্দের অনাবৃত দেহ থেকে জ্যোৎস্নার আবরণ 'লক্ষ আলিঙ্গন' ও 'কোটি চুম্বন' দিয়েও হেরম্ব ঘোচাতে চায় না। হেরম্বের জীবনে দ্বিমুখী সম্পর্কের টানাপোড়েনের সৃষ্টি করেছে সুপ্রিয়া ও আনন্দ। অসুস্থ অশোকের শরীরের

প্রয়োজনে হেরম্বের আহ্বান গ্রহণ করে পুরীতে এসেছে সুপ্রিয়া। হেরম্ব কিন্তু তখন অনাথ-মালতীর অতিথি, আনন্দের অপার্থিব প্রেমে বন্দী। অনাথ গৃহত্যাগ করে চলে গেছে বিকারগ্রস্তা মালতীকে রেখে এবং আনন্দকে হেরম্ব বিবাহ করবে এই প্রতিশ্রুতির নিশ্চিন্ত ভরসায় মালতী তার খোঁজে গৃহত্যাগ করেছে। আনন্দ হয়তো হেরম্বের জীবনে দীপ জ্বালাতে পারত। কিন্তু তার নিষ্পাপ হৃদয়ে অশান্তি ও অবিশ্বাসের আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল। লোকালয়ের বাইরে গিয়ে হেরম্বের ঘর বাঁধার প্রতিশ্রুতিতেও সে আর উৎসাহ বোধ করেনি। স্বপ্ন ক্ষুণ্ণ হওয়ার অপরাধে সে মানুষকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। কোনো লৌকিক আধারে তার দেহাতীত শুদ্ধ প্রেমকে ধরে রাখা আর সম্ভব ছিল না – মৃত্যুর মহান আলিঙ্গনে সে তাই ধরা দিল। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পূর্ণিমার রাত্রে লৌকিক লজ্জার ঊর্ধ্বে উঠে সে আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে নিজের পরিশুদ্ধ প্রেমকে বাস্তব জগতের সংশয় ও সংকীর্ণতা থেকে বাঁচাতে পারল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই আদর্শবাদ ও রোমান্টিক জীবনভাষ্যের উপর একের পর এক আঘাত আসতে থাকে। বিশেষ করে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, নব্য বিজ্ঞানের অনিশ্চয়তাবাদ, মার্কসের শোষক ও শোষিত শ্রেণির দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের বিশ্লেষণ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ প্রতিষ্ঠা, ফ্রয়েডের অবচেতন ও অচেতন মনের আবিষ্কার যৌন আকাঙ্ক্ষাকে মানুষের কেন্দ্রীয় ভাবনায় স্থাপন ইত্যাদি চিন্তাজগতে এক নবযুগের সূচনা করে। এই ভাবনাগুলোর দ্বারা বস্তুতন্ত্রবাদের যেমন প্রতিষ্ঠালাভের ঘটে তেমনি রোমান্টিকতা ও জীবনের সত্য-শিব-সুন্দরের ধারণার প্রতি প্রবল আঘাত হানে। সাহিত্যের মধ্যে জীবন সম্পর্কে একটা ব্যর্থতাবোধ যেমন এল তেমনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসও চলে গেল। একটা নৈরাশ্য, অসহায়তা, শুভ কিছুর প্রতি বিশ্বাসহীনতা, একটা বিচ্ছিন্নতাবোধ মানুষকে গ্রাস করল। শিল্পীরা নতুন করে জীবনের অর্থ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অনেকেই মত পোষণ করতে আরম্ভ করলেন জীবনের মৌলিক গুণগুলি – স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া – পরিবেশের একটু অদল বদল ঘটলেই এগুলো অন্তঃসারশূন্য।

তিরিশ দশকে বাংলা সাহিত্যে এক বিদ্রোহের যুগ দেখা যায়। রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে, আদর্শবাদের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, জীবনকে নতুন করে পর্যালোচনা। জীবনের নতুন অর্থ অন্বেষণ, বাস্তবতার প্রতি গভীর নিষ্ঠা। বিশ্বাস ও চিরন্তন মূল্যবোধগুলোর প্রতি তীব্র সংশয় দেখা দেয়। পরবর্তীকালে বহু লেখকদের মধ্যে দেখা যায় কোনরকম পূর্ব সংস্কারের বশবর্তী না হয়ে খোলা মনে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণর মধ্য দিয়ে মানবচরিত্রের যে রূপটি পাওয়া যায় তাকেই তারা গ্রহণ করেছেন। ভাবে ও ভাষায় রোমান্টিকতাকে ত্যাগ করে নিষ্ঠুর সত্যকে গ্রহণ করা ও তাকে শিল্পরূপ দেওয়া তাদের প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

রোমান্টিক ঔপন্যাসিকরা প্রেম সম্পর্কে একটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন

করলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রেম নশ্বর, প্রেমের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, রোমান্টিক ভাবনায় প্রেম এক শাশ্বত অনুভূতি বলে অভিহিত। কিন্তু আধুনিক বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক দেখালেন আর পাঁচটা অনুভূতির মতোই প্রেমের আবির্ভাব ও তিরোভাব দুইই আছে। একদিকে যাকে গভীরভাবে ভালোবাসা যায় আর একদিক তার জন্য কিছুমাত্র আকর্ষণ থাকে না। যে অচেতন মন থেকে ভালোবাসা চেতন মনে আবির্ভূত হয় সেই চেতন মনেই ভালোবাসা একদিন নিঃশেষিত হয়ে যায়। 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে হেরম্ব আনন্দকে বলেছে – "ভালোবাসা থাকলে শোক হয় আনন্দ। কিন্তু ভালোবাসা কত দিনের ? কতদিন স্থায়ী হয় ভালোবাসা .. প্রেম অসহ্য আত্মঘাতী যন্ত্রণার ব্যাপার। প্রেম চিরকাল টিকলে মানুষকে আর টিকতে হত না। প্রেমের জন্ম আর মৃত্যুর ব্যবধান বেশি নয়। ... একমাসের বেশি প্রেম কারো সহ্য হয় ? মরে যাবে আনন্দ – একমাসের বেশি হৃদয়ে প্রেমকে পুষে রাখতে হলে মানুষ মরে যাবে। মানুষ একদিন কি দুদিন মাতাল হয়ে থাকতে পারে। জলের সঙ্গে মদের যে সম্পর্ক মদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তাই– প্রেম এত তেজি নেশা।" যে ভালোবাসা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়, সেই ভালোবাসার মৃত্যুও মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে সমস্ত নায়ক নায়িকা একদিন ভালোবাসত কিন্তু আজ আর ভালোবাসে না। ভালোবাসার এই নশ্বর রূপ এখানে প্রতিক্ষেত্রে বিদ্যমান।

তথ্যসূত্র

১. শরৎচন্দ্র পুনর্বিচার : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : দে'জ পাবলিশিং
২. উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র : শিশির মজুমদার : এস ব্যানার্জী এন্ড কোং
৩. শরৎচন্দ্রের পল্লিসমাজ : বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য : বামা পুস্তকালয়
৪. কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র : নারায়ণ চৌধুরী : এস মুখার্জী এন্ড কোং প্রা লি
৫. শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ : প্রসূন মুখোপাধ্যায় : রত্নাবলী
৬. উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম : প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত : প্রজ্ঞাবিকাশ
৭. বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর : দীপঙ্কর মল্লিক : দে'জ পাবলিশিং
৮. উপন্যাসে আধুনিকতা : চোখের বালি হীরেন চট্টোপাধ্যায়।
৯. রবীন্দ্র উপন্যাস, চোখের বালি – শুক্লা মুখোপাধ্যায়
১০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন দৃষ্টি ও শিল্পরীতি– গোপিকনাথ রায়চৌধুরী : দে'জ পাবলিশিং
১১। বাংলাসাহিত্যে রোমান্টিসিজম : গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়, পত্রভারতী